‘সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?’

সকালে মনে হলো একটা নিবন্ধ লেখার কথা। প্রসঙ্গ হাতড়াচ্ছিলাম। দেশের অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে অনুমান করতে পারলেও, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তাই সে প্রসঙ্গ এড়াতে চাচ্ছিলাম। বাসার বাইরে একটু কাজ ছিল। ভাবলাম, কাজটাও করে আসি, আবার অবরোধটাও নিজ চোখে দেখে আসি। টিভি চ্যানেলের ছবির ওপর তো বিশ্বাস হারিয়েছে অনেক আগেই। বিশ্বাস যে কোথায় আছে তাও তো জানি না! আচ্ছা, নির্বাচন নিয়ে যে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, সব কিছুই মনে হয় নির্বাচন কমিশনের গা-সওয়া হয়ে গেছে। রংপুরের উপনির্বাচনে সিসি ক্যামেরা লাগাতে পারলো, আর বি-বাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর উপনির্বাচনে কেন তা পারলো না। বি-বাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর উপনির্বাচনে যে বার্তা বয়ে আনলো তা কি আগামী নির্বাচনের জন্য সুখকর? কি বার্তা এলো? কথায় বলে ‘ইল্লত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম’লে’– কথাটা মিথ্যে নয়। প্রবাদ তো আর এমনিতে চালু হয় না। যাহোক, চলতে পথে লেখার উপাদান পেয়ে গেলাম। ‘পড়বি পড় মালির ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই।’ আজ আর নিবন্ধ-টিবন্ধ লিখতে ভালো লাগছে না। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প করি। আসলেই জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

তখন বয়স পনেরো-ষোলো হবে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আগে আন্দোলন চলছে, চলছে গণজাগরণের প্রস্তুতি। এলো সত্তরের নির্বাচন। আমি তেমন কিছু বুঝতাম না। হাইস্কুলের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছি। মিছিলে যেতাম। ছাত্রনেতাদের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। শুনতাম, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আমাদের প্রতি চাপিয়ে দেওয়া বঞ্চনার কথা, শোষণের কথা; পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদিত চিনির দামের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানে চিনির দাম সস্তার কথা। কর্ণফুলি মিলের কাগজের দাম দিস্তা প্রতি এদেশে ১৪ আনা, অথচ সেখানে ১০ আনায় পাওয়া যায়, সে কথা। আমাদের এখানে মানুষ গরিব, তিন বেলা খেতে পায় না, অনেকেই পুরো লুঙ্গিও পরতে পারে না। আরো অনেক কথা– সবই সত্য। বিভিন্ন রকম শোষণের কথায় মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতো। বৈষম্যের মধ্যে শুনতাম– অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাজেট ভাগাভাগিতে বৈষম্য, ধনী-গরিবের বৈষম্যসহ অনেক বৈষম্য। যাহোক, নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর হলো না এবং নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের কারণে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নামলেন। নয় মাসের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উদ্দেশ্য লেখা হলো– সাম্য বা সমতা (রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ বণ্টনব্যবস্থায় সমতার ভিত্তিতে বণ্টন; সামাজিক সমতা, রাজনৈতিক সমতা, অর্থনৈতিক সমতা, আইনগত সমতা, ব্যক্তিগত সমতা), সামাজিক ন্যায়বিচার (প্রতিটা নাগরিকের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার রয়েছে), মানবিক মর্যাদা (মানবিক অধিকার বা স্বাধীনতা)। ১৪ই এপ্রিল প্রবাসী সরকারের নির্দেশাবলীতে আরো উল্লেখ আছে– “বাঙালির অপরাধ তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ তারা মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার দাবি করেছে। বাঙালির অপরাধ তারা আল্লাহ-সৃষ্ট পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশমত অন্যায়-অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছে।”

স্বাধীনতা অর্জন বায়ান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। এতটা বছরে আমরা কি দেখে আসছি? সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে অধিক হারে সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে, সিংহভাগ মানুষ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে না। আমরা এমন একটা সমাজ গড়ছি যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমাজের চেয়েও বৈষম্যপীড়িত। সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পেয়েছে। আমরা কি শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি? আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কোষাগার লুটপাট করে বিদেশে নির্দ্বিধায় অর্থ পাচার চলছে। সরকারের আশপাশে যারা থাকেন তারাই লাভবান হন। অথবা বলা যায় সুবিধা অর্জনের জন্যই ক্ষমতাসীনদের পাশে একটা শ্রেণি ঘুরঘুর করেন, রাজনীতিতে যোগ

দেন, মোসাহেবি করেন, ফায়দা লোটেন। 'ওস্তাদ দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইলে শিষ্যরা পাক দিয়ে নেচে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে বাজেট বরাদ্দ হয়, তা মাঝপথেই 'সিস্টেম লসে' হারিয়ে যায়। উন্নয়ন বাজেটও তথৈবচ। খাতওয়ারি দেখা দরকার। প্রতিটাতে নিজস্ব অর্থায়নে কত এবং ধার-কর্জ অর্থায়নে কত? কত বছরে পরিশোধযোগ্য? প্রোপ্রাইটি অডিট (যথার্থতা পরীক্ষা) করা দরকার। এতে সত্য বেরিয়ে আসে। ন্যায়বিচার খুঁজতে গেলে বইয়ের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। সকল অন্যায়-অবিচার এদেশের সামাজিক কালচারে পরিণত হয়েছে। সমাজে সব রকমের অন্যায়-অত্যাচার সহনশীল হয়ে গেছে; বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীর জাঁকান্দানি শোনার কেউ নেই, অবিরাম চলছে। আমি যত কথাই লিখি না কেন, পড়ার লোক নেই, কিংবা 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, বলার কিছু ছিল না' অবস্থা। আমার মতো শত শত প্রাবন্ধিক প্রতিনিয়ত এগুলো লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করে ফেলেছেন। 'কাজির গরু খাতায় পাওয়া যায়, গোয়ালে নেই'। তাই আজ প্রবন্ধ না লিখে গল্প লিখতে বসেছি।

আজ আমার কাজ শেষে বাসায় ফেরার পালা। রাস্তা পার হয়ে একটা রিক্সা নিলাম। রিক্সাওয়ালা হালকা-পাতলা গড়নের, মুখে দাড়ি। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোঠায়। অতটা লক্ষ্য করিনি। কিছুদূর এসে তাকে থামতে বললাম। উদ্দেশ্য– পথের দোকান থেকে বাসার জন্য এক ডজন দেশি কলা ও এক কেজি পেয়ারা কেনা। পথের দুধারে এমনই শত শত ফুটপাথ-দোকানি। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা পরণের কাপড় ও মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কায়ক্লেশে জীবন নির্বাহ করছে। কলা ও পেয়ারা কিনে রিক্সায় ওঠার আগেই রিক্সাওয়ালাকে একটা পেয়ারা ও দুটো কলা হাতে দিয়ে খেতে বললাম। উনি না খেয়ে রেখে দিলেন। মনে হলো ওনার রিক্সা প্যাডেল করতে কষ্ট হচ্ছে। বাসার সামনে নামার সময় আমাকে নামতে সহায়তা করলেন। আমি তার গ্রামের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, চাঁদপুর। ভাড়া কত বলেছিলাম এতক্ষণে ভুলে গেছি। তাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, তিনি চল্লিশ টাকা চেয়েছিলেন, আমি ত্রিশ টাকা দিতে চেয়েছিলাম। ভাড়াটা চল্লিশ টাকা দিতেই উনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলাম, একটা মলিন রোগা মুখ। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অসুস্থ না-কী? বললেন, হ্যাঁ। পেটের কাপড়টা সরিয়ে দেখালেন, অপারেশনের রোগী। পেটে বেশ বড় একটা কাটা, অনেকগুলো সেলাইয়ের দাগ। দাগ শুকিয়ে গেছে। সংসারে বড় দুটো মেয়ে, লেখাপড়া তিন-চার ক্লাস পর্যন্ত করেছে। টাকা যোগাড়ের অভাবে বিয়ে দিতে পারছেন না। ছোট একটা ছেলে। হয়তো লেখাপড়া শিখতে পারবে না। তিনিও লেখাপড়া জানেন না। তার বাপও লেখাপড়া জানতেন না, শুনেছি। বংশপরম্পরা এমনটিই চলে আসছে। সংসারে উপার্জনের আর কেউ নেই। তাই রিক্সা নিয়ে বেরোতে হয়। রিক্সা ভাড়াটা ফেরত নিয়ে টাকা বাড়িয়ে হাতে দিলাম। নিজের থাকার জায়গাটা দেখিয়ে বললাম, মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে আমার সাথে একবার দেখা করে যাবেন। বাসায় এলাম। বাসার সবাই কলা ও পেয়ারা পেয়ে খাওয়া শুরু করে দিলো। আমাকেও দিলো। মুখে তুলতেই লোকটার সেই মুখচ্ছবিটা অবিকল ভেসে উঠলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু স্মৃতি মনে পড়লো। নেতাদের দেওয়া কথাও মনে পড়লো। কলাটা মুখে না দিয়ে নামিয়ে রাখলাম। খাবার টেবিল ছেড়ে নিজ রুমে চলে এলাম। এমন ক'জনকে সাহায্য করে পারা যায়। এরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটিতেও ঠেকতে পারে। আমাদের উন্নতির চিৎকারের শব্দে ওদের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, সে কাজের কি হলো?

রুমে এসে যুদ্ধের আরো আগের একটা গল্প মনে পড়লো। একটা গ্রামে কয়েক ঘর নিম্ন-সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো। গ্রামের ভাষায় তাদের মুচি সম্প্রদায় বলা হতো। গ্রামে তখন বিনোদনের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। তারা কয়েকজন মিলে জারি গানের দল তৈরি করলো। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে সন্ধ্যার পর জারি গানের আসর বসে। মরা গরুর চামড়া ছুলে বাজারে বিক্রি করে কিছু টাকা উপার্জন ওদের অন্যতম পেশা। একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টা দেড়েক আগে

দুরের গ্রামে ৬/৭ জনের দল বেঁধে জারি গান গাইতে চলেছে। নিজ গ্রাম পেরোতেই একটা মাঠ। কিছুদূর যেতেই একজন দেখলো, একটা নাদুসনুদুস গরু চার পা সটান করে মরার মতো শুয়ে আছে। একজন অন্যজনকে ইশারা করে দেখালো– শিকার পড়ে আছে। ক্ষুর, চাকু, উকো (ফাইল) ও একটা বড় থলে ওরা সব সময় সাথেই রাখে। কি করা যায় সবাই বসে পরামর্শ করলো। দলনেতা দু-জনকে চামড়া ছাড়ানোর কাজে রেখে বাকিদের নিয়ে জারির আসরে যোগ দিতে চলে গেল। সন্ধ্যা শেষে জারির আসর শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে লোকের ভিড়। ঢোল ও খঞ্জনির তালে তালে জারির আসর মাত। বেশ পরে রেখে-যাওয়া দুজন আসরে যোগ দিল। দুজনকে দেখে বয়াতির আর ধৈর্য্য ধরছে না। জানতে ইচ্ছে করছে, সে কাজের কী হলো? গান রেখে আলাদাভাবেও জিজ্ঞেস করা সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা ঢোল ও খঞ্জনির তালে তালে নেচে নেচে সুর করে গেয়ে চললো, 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে'? তার বারবার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কতক্ষণ আর চুপ থাকা যায়! অন্য দুজনের মন খারাপ।

শীতের বিকেলে অনেক গরুই ঘাস খেয়ে পেট ভরে গেলে রোদ পোহাতে চার পা ছড়িয়ে দিয়ে জমিতে শুয়ে থাকে। কারো মনে হতে পারে কোনো চাষী মরা গরু জমিতে ফেলে রেখে গেছে। দুজন প্রথমেই ফাইলে ছুরি-চাকু ধার দিয়েছে, বিড়ি ফুঁকেছে। আনন্দের সাথে গরুর পায়ের কাছে গিয়ে যেই-না পায়ে ছুরি চালাতে গেছে, গরুটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘাস খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। ঐ দুজনের চমকে উঠে মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে আসা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তারাও দেরীতে হলেও আসরে যোগ দিয়েছে। বয়াতির বারবার 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?' প্রশ্নের উত্তর দিতে ঐ দুজন উঠে দাঁড়িয়ে ঢোল ও খঞ্জনের তালে তালে হাত ও পাছা দুলিয়ে গাওয়া শুরু করলো, 'চাখাইতে-চোখাইতে, চরণো ধরিতে, উঠে ঘাসো খেলো হে'। নিম্ন-সম্প্রদায়ের ঐ জারি-গানের দলের সকলে নিশ্চয়ই এতদিনে স্বর্গ পেয়েছেন। তারা এতদিন এদেশে বেঁচে থাকলে কি জারি গাইতেন, তা আমার জানতে ইচ্ছে করে।

(২১ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।